আমার ডাক্তারি

(গল্পগ্রন্থ – রূপহলুদ)

আমাকে দত্তমশাই ডেকে বল্লেন—ও ডাক্তারবাবু, জল খেয়ে নিন একটু—

আমি বল্লাম—এখন থাক্, এর পরে হবে।

—না না, সে কি হয় ? আসুন, সামান্য কিছু।

আমার এ সম্বন্ধে একটু বাধ-বাধ ঠেকে। রোজ রোজ আমাকে বাইরের ঘর থেকে ডেকে এনে জলখাবার খাওয়ানো চাই-ই। আমি ডাক্তারি করি পাড়াগাঁয়ে—নলিনী দত্তমশাইয়ের বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে থাকি। আমার কাছে ভাড়া তিনি নেন না। বলেন—না না, ব্রাহ্মণ দেবতা। আপনি আমার বাড়িতে দয়া করে বাস করচেন, এতেই আমার ভিটে পবিত্র হয়ে যাচ্চে। আবার ভাড়া নেবো এই পাড়াগাঁয়ে আপনার কাছে?

সে যাক্ গে। ভাড়া না হয় না নিলেন। কিন্তু রোজ সকালবেলা ডেকে আমায় জলখাবার খাওয়ানো চাই। মুড়ি, গুড়, চিঁড়ে, নারকোল—যেদিন যা জোটে, একটা পাথরের খোরা ভর্তি করে দেবেন। অত খাওয়া আমার অভ্যেস নেই বল্লেও শুনবেন না। আমার লজ্জা করে রোজ রোজ খেতে। ভাড়া নেবেন না, তার ওপর রোজ জলখাবার! এও একরকম জুলুম ছাড়া আর কি?

দত্ত মশায়ের মেয়ে এসে বল্লে—ডাক্তারবাবু, আপনি না খেলে বাবা কি কিছু খাবেন? দাঁতে কুটো দেবেন না।

—কেন?

—ব্রাহ্মণ বাড়িতে অভুক্ত থাকলে বাবা খাবেন না।

—বটে। আচ্ছা চলো।

সেদিন গিয়ে দেখি চালভাজা, ছোলাভাজা আর বুনো নারকোল কোরা। পৃথক্ বাটিতে খেজুরগুড়। চায়ের ব্যবস্থা এদের বাড়িতে নেই, সেকেলে গৃহস্থ, চা খাওয়ার রেওয়াজ গোড়া থেকেই গড়ে ওঠেনি।

আমি পাস-করা ডাক্তার নই। বাড়িতে বই দেখে হোমিওপ্যাথি শিখে আগে গ্রামেই ডাক্তারি করতাম। কিন্তু গ্রামের লোক পয়সা দিতে চায় না। ধার-বাকি ফেলে আর শোধ করে না। তা দেখেশুনে এই রঘুনাথপুরে এসে বসেচি আজ প্রায় তিন-চার মাস। আমাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে—আট-ন' ক্রোশ। রেল নেই, হাঁটাপথে আসতে হয়। এ গ্রামে এসে প্রথমে এক চাষী-কৈবর্ত গৃহস্থবাড়িতে দিন পনেরো ছিলাম।হঠাৎ একদিন সকালে নলিনী দত্তমশায় গিয়ে আমায় বল্লেন—প্রাতঃপ্রণাম হই ডাক্তারবাবু। আপনার নিবাস কোথায়?

—আসুন, বসুন। আপনার এ গ্রামে বাড়ি?

আমার বাড়ির মালিক আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লে—উনি এ গাঁয়ের একজন কর্তাব্যক্তি লোক। ওঁর নাম নলিনী দত্ত।

দত্তমশায় তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—না, না, কর্তা না হাতি! ও সব কিছু না। তা গিয়ে, আপনার কাছে এসেছিলাম একটা অনুরোধ করতে।

—কি, বলুন?

—আমার বাড়িতে দয়া করে আপনাকে থাকতে হবে। আমার বাইরের ঘর আছে। কোনো অসুবিধে হবে না।

—ভাড়া কি রকম দিতে হবে?

—আপনার নিজের বাড়ি। ভাড়া দেবেন কাকে? চলুন দিকি জিনিসপত্তর নিয়ে!

ভারি অদ্ভুত লোক তো! কিছুতেই ছাড়লেন না। লোক পাঠিয়ে জিনিসপত্তর নিয়ে গেলেন মুকুন্দদের বাড়ি থেকে। গত মাঘ মাসের কথা।সেই পর্যন্ত এখানেই আছি।

আজ নলিনী দত্ত বাইরে এসে বল্লেন—এখন কোথাও যাবেন?

—না।

—রুগী কি রকম হচ্চে?

—মন্দ না।

—রোজ কি রকম হয়?

—তার কিছু ঠিক নেই।

—দৈনিক দুটো করে টাকা তো হওয়া চাই-ই।

—তা এখনো হয়নি।

—ইয়ে, রাঁধবেন আজ একটু দেরিতে।

আমি তখনই বুঝেচি, কোনো একটা কিছু দিতে চাইচেন। রোজ রোজ নেওয়াটা ঠিক নয়।চক্ষুলজ্জায় বাধে না? কি একটা ওজন করব ভাবচি, এমন সময় দত্তমশায় বললেন—একটা বড় মাছ আজ নেদের বাগান পুকুর থেকে ধরতে বলেচি। রসিক সর্দার বলে আমার এক বাল্যবন্ধু, সে-ই নিয়ে আসবে। আপনাকে মাছ একটু দেবো।

—ও, আচ্ছা বেশ।

আর কি বলি! রোজই এই রকম চলচে।

দুপুরের পর হঠাৎ চারজন লোক এসে হাজির। হাতে পোঁটলা, কাঁধে ছাতি। দত্তমশায়ের কাছে খবর গেল। তিনি খেয়ে একটু শুয়েছিলেন। শুনে বাইরে এলেন। ওঁদের দেখে আনন্দে বিগলিত ও কৃতার্থপ্রায় হয়ে বিনীত সুরে হাতজোড় করে বল্লেন—আসুন আসুন। পরম সৌভাগ্য। ওরে ও দীপু, গা-পা ধোবার জল দিয়ে যা—

দীপু দত্ত মশায়ের বিধবা মেয়ে। বাড়িতে অন্য মেয়েমানুষ নেই। হাত-মুখ ধোওয়ার জল সে-ই নিয়ে এল। দত্তমশায় বল্লেন—তা হলে আপনাদের আহারের যোগাড় করি?

ওঁদের মধ্যে একজন বল্লেন—হ্যাঁ, তা হোক।

আবার বেচারী দীপুকে অসময়ে আগত এই চারজন জোয়ান অতিথির জন্যে রান্না করতে হয়। তাই কি ভাতে-ভাত রান্না? তা হবার জো নেই। দত্তমশায় বসে তদারক করবেন, অতিথিদের পান থেকে চুন না খসে। এরা নেয়ে এসে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে রইল। দত্তমশায় ধোপদস্ত চারখানা ধুতি বের করে দিলে তবে পরলে। তারপর জলযোগ সেরে ওরা বসে যখন তামাক খাচ্চে তখন কৌতূহল আর না চাপতে পেরে জিগ্যেস করলাম—আপনাদের নিবাস ?

দুজন বল্লে, হাটগাছা। অন্য দুজনের বাড়ি অন্য এক গাঁয়ে। বল্লাম—দত্তমশায় বুঝি আত্মীয়?

একজন বল্লেন—না, আত্মীয় নন।

পরে শুনলাম ওঁরা এখানে আসেন খাজনা আদায় করতে।

বছরে একবার বা দু'বার আসেন এবং এখানেই ওঠেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামে এঁদের নিজের নিজের বিষয়সম্পত্তি আছে। প্রতিবার এসে দশ-বারো দিন থাকেন। খাজনা হঠাৎ তো আদায় হয় না, একজন প্রজার কাছে একবারের জায়গায় দশবার ছুটতে হয়, তবে তারা পয়সা বের করে।

এবারও রইলেন প্রায় দশ দিন। যতক্ষণ একটি প্রজার কাছেও খাজনা বাকি থাকবে, ততদিন এঁরা নড়বেন না। আর অসীম ধৈর্য আর আতিথেয়তা দেখলাম দত্তমশায়ের। এক একবার মনে হত পায়ের ধুলো নিই দত্তমশায়ের।

সকাল থেকে ছুটোছুটি করচেন কোথা থেকে গলদা চিংড়ি মাছ আনা যায়, ভালো কই মাছ কি করে সংগ্রহ করা যায়, অমুকের বাড়ি থেকে পটল আনচেন, অমুকের বাড়ি থেকে মানকচু আনচেন। সর্বদা চেষ্টা অতিথিদের কি করে খুশী করবেন, কি করে ভালো খাওয়াবেন। এরাও জানে দত্তমশায়ের হোটেলে যতদিন ইচ্ছে থাকো, কেউ বারণ করবার নেই।

আমার কষ্ট হত দীপু বেচারীর জন্যে।

হোটেলের রাঁধুনী তো আর দ্বিতীয় নেই।

দুবেলা রান্না, তাও কি সোজা রান্না, হরেক রকমের রান্না, গরমজল, কাপড়ে সাবান দেওয়া, সর্দিকাশির পাঁচন জ্বাল দেওয়া—সব ঐ বেচারীর ঘাড়ে।

—ওরে দীপু, সরকার মশায়ের বড় সর্দি হয়েচে, একটু পাচন করে দিস্ তো!

দীপু অমনি বেরুলো গুলঞ্চের লতা আর বাসক-ছাল যোগাড় করতে।

একদিন দেখি বক্‌চেন মেয়েকে।

—তোর একটু হুঁশ করে চলা উচিত। কাল বিশ্বেস মশায়কে মশারি টাঙিয়ে দিলি— তা দেখলিনে কোথায় ছেঁড়া, তিনি সারারাত ঘুমুতে পারেননি মশার উপদ্রবে। কেন, দেখে তখনই একটু সেলাই করে দিলেই মিটে যায়! তোর হুঁশ বড় কম—

মনে মনে ভাবলাম, ওর হুঁস যদি কম হত তবে আপনার এ অবারিত-দ্বার হোটেল কোন্‌কালে দরজা বন্ধ করে লালবাতি জ্বালতো।কি রত্ন পেয়েছেন ঘরে, তা ভালো করে চোখ চেয়ে দেখুন।

একদিন দেখি, বাড়ির সামনের জঙ্গলের মধ্যে দীপু কি করচে। বেলা পড়ে গিয়েচে, সন্ধে হয়-হয়, বল্লাম—কি ওখানে দীপু?

কচুর ডাঁটা কাটবো।

—এখন কেন?

—ওনারা কাল কচুর শাক খাবেন বাবা বল্লেন। তাই এখন তুলে ধুয়ে রাত্রে কুটে রেখে দিই। সকালে সময় পাবো না।

—এখন অবেলায় ওখানে না যাওয়াই ভালো।সাপ বেরুতে পারে।

—এখন না তুল্লে তুলবো কখন? কাল সময় পাবো না। আজ সারাদিনের মধ্যে এখন একটু যা সময় পেলাম।

—দত্তমশায় কোথায়?

—তিনি ইলিশ মাছ আনতে গিয়েচেন পাঁচঘরার হাটে। কাল কচুর শাক দিয়ে রান্না হবে কিনা।

—আজ ইলিশ মাছ এনে কাল রান্না হবে?

—কেন হবে না? আজ বেশ করে ভেজে রাখবো রাতে। কাল মাছ পাবেন কোথায় হাট ছাড়া? কাল না খাওয়ালে ওঁদের কচুর শাক খাওয়ানো হবে না। পরশু চলে যাবেন সব।

—যাবেন সত্যি? আমার মনে হচ্চে না!

দীপু আমার কথার শ্লেষ বুঝতে না পেরে বল্লে—কেন মনে হচ্চে না?

মেয়েও তো দত্তমশায়েরই। বাপের মতই সরল। বল্লাম—না, তাই বলচি।

—বাবা বলছিলেন কালকের দিনটা ওঁরা আছেন, পরশু চলে যাবেন। কাল রাতে তালের বড়া করে খাওয়াতে।

—বেশ বেশ, খাওয়াও।অতিথিসেবায় পরম পুণ্য।

—কত রকমের রান্না হচ্ছে বাড়িতে! কিন্তু আপনাকে দিতে পারিনে বলে কষ্ট হয়।

—দিতে বাধা দিচ্চে কে? আমি বাধা দিইনি অন্তত।

—কি যে বলেন! ব্রাহ্মণের পাতে রান্না তরকারি দেবো সে ভাগ্যি কি আর করে এসিচি ?

—তা হলে মিটেই গেল।

—একটা জিনিস কাল খাওয়াবো।

—কি?

—বলুন না?

দীপুর চোখে কৌতুকের হাসি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ও কি জিনিসের কথা বলচে। তবুও মজা দেখবার জন্যে বল্লাম—তুমি বলো, আমি বুঝতে পারলাম না। কচুর শাক?

দীপু হি-হি করে হেসে বল্লে—না। আহা, কি বুদ্ধি আপনার! কচুর শাক তো সক্‌ড়ি। আমার রান্না কচুর শাক আপনার পাতে দেবো?

আমি কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লাম—সে আমার অদৃষ্ট।

—আহা! আপনার অদৃষ্ট না আমাদের অদৃষ্ট! আপনি ভারি—

—কি জিনিসটা কাল খাওয়াবে বল্লে না?

—তালের বড়া।

—ওটা বুঝি সক্‌ড়ি নয়? তবুও মাথা রক্ষে। বাঁচলুম।

—থাক্‌, আপনাকে আর ব্যাখ্যান করতে হবে না। চলি এখন, অনেক কাজ।

দীপুকে দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ওর বয়েস হবে, কিন্তু বালিকার মত সরল।মুখ বুজে কি খাটুনিটাই খাটে দিনরাত! বাবার মন যুগিয়ে চলতে ওর জোড়ানেই, দত্তমশায় মুখের কথা খসালেই হল। ও কি খায় সারাদিন খাটুনির পর তা কে দেখচে? দত্তমশায় নিজের অতিথিদের নিয়েই ব্যস্ত। তাদের বেলা পান থেকে চুন না খসে।

পরের দিন শুনলাম অতিথিরা আরো দিন-চার-পাঁচ থেকে যাবেন। খবরটা পেলাম দত্ত মশায়ের মেয়ের কাছ থেকেই। সে এসে বল্লে—আমার পাপ হবে না ডাক্তারবাবু?

অবাক্‌ হয়ে বল্লাম—পাপ? কিসের পাপ?

আপনার কাছে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলাম না, সেইজন্যে?

—কি কথা?

দীপু কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। আমি ওর কথা শুনি মন দিয়ে। সায় দিই ওর কথায়, বোধ হয় ওর ভালো লাগে। কথা বলবার মানুষ এ বাড়িতে আর ওর কেউ নেই আমি ছাড়া।

ও বল্লে—ভুলো কেন ও-রকম আপনি? তালের বড়া খাওয়াতে চেয়েছিলাম আজ, মনে আছে? তা আজ হল না।

—তা হলে অতিথিদের তালের বড়া খাওয়ানো হল না?

—সেই জন্যেই তো। ওঁরা কাল যাবেন না। আরো দিন-চার-পাঁচ থাকবেন কিনা, তাই বাবা বললেন আজ না করে ওঁদের যাবার আগের দিন করলেই হবে।

—খুব ভালো কথা। কিন্তু ওঁদের তো কালই যাবার দিন ধার্য ছিল?

—কি নাকি বাঁশঝাড় নিয়ে গোলমাল বেধেচে ওঁদের মধ্যে একজনের। সে গোলমাল না মিটিয়ে তো যাওয়া হয় না।

—সে তো বটেই। একজনের কাজ যখন বাকি, তখন বাকি তিনজন একযাত্রায় পৃথক্ ফল করে আর যান কি ভাবে! যাওয়া উচিত নয়।

—সে আবার কি?

—ওই একটা কথার কথা ধরো।

—ভারি মজার কথা বলেন আপনি কিন্তু !হাসি পায় এমন!

—সে যাক্, তাহলে তালের বড়া হচ্ছে কবে?

—সেই যেদিন যাবেন, তার আগের দিন। তবে শুনুন একটা কথা বলি। আপনার জন্যে ছোট্ট একটা তাল এনে রেখেচি। সেইটেই গোলা করে অল্প চাট্টি বড়া আপনাকে ভেজে দেবো এখন সন্দেবেলা।

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লাম—না, দীপু। লক্ষ্মী, আমার কথা শোনো।আমার জন্যে আলাদা করে তোমায় কিছু করতে হবে না। কেন করতে যাবে তা? আমি ওতে রাগ করবো।না, করবে না।

দীপু না দাঁড়িয়ে চলে গেল। ও কখন আসে, কখন যায়, বোঝা যায় না। নাঃ, এর সঙ্গে পারা যাবে না। আমার কোনো দরকার নেই তালের বড়ার। ও কি শুনবে কোনো কথা? যেমন বাবা, তেমনি মেয়ে।

অতিথিদের ওপর ভারি রাগ হল আমার।

এসেচ নিজেদের খাজনা আদায় করতে, বিষয়-আশয় দেখতে, তা পরের ঘাড়ে কেন রে বাপু? মানুষের একটা চক্ষুলজ্জা থাকা উচিত! বাবা আর মেয়েকে সরল আর ভালোমানুষ পেয়ে—হত অন্য জায়গা, এতদিন সেখানে বসে আজ পায়েস, কাল রুইমাছ খেতে কেমন দেখতাম!

অতিথিদের একজনের নাম জনার্দন সরকার, ধূর্ত দৃষ্টি চোখে, কূট বিষয়ী আর মামলাবাজ, দেখলেই বোঝা যায়। আমায় বিকেলের দিকে ডেকে বল্লে—ও ডাক্তারবাবু, বলি কি হচ্চে?

নীরস সুরে বল্লাম—কিছুই না। বসে আছি।

—এখানে রুগীপত্তর কেমন?

—মন্দ না।

—কতদিন আছেন এখানে?

ভালো বিপদ! আমার গল্প করবার ইচ্ছে নেই ওর সঙ্গে!

আছি না আছি, সে খোঁজে কি দরকার তোমার? তোমার গলা জড়িয়ে ধরে সে-সব বর্ণনা করবার ইচ্ছেও আমার নেই। বল্লাম—কেন বলুন তো?

—না, সেবার এসে আপনাকে দেখিনি কিনা তাই।

—আপনারা ফি-বছর আসেন বুঝি এখানে?

—তা আমরা আসছি আজ দশ-এগারো বছর। নরসিংহপুরে আমার তালুক আছে। এই সময় খাজনা আদায় করতে আসি। আমরা ক'জনই আসি। সকলেরই বিষয় আছে পাশাপাশি মৌজায়। এসে দত্তমশায়ের বাড়ি উঠি। উনি স্বজাতি আর বড় ভালো লোক। আর কোথায় যাই বলুন!

—তা তো বটেই। কোথায় আর যাবেন। আজকাল কেউ কাউকে জায়গা দেয় না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে।আমি ঘরের দাওয়ায় বসে ভাবচি এইবার রান্নার আয়োজন করা যাক। এমন সময় দীপু হাসিমুখে দাওয়ায় উঠে একটা পাথরের বাটি আমার সামনে রেখে বল্লে—এই নিন। আলো জ্বালেননি?

বল্লাম—না, এই ভাত রান্না করবো ভাবচি এখুনি। এবার জ্বালাবো।এতে কি?

বলে বাটিটা হাতে তুলে নিয়ে দেখি তালের বড়া। সদ্য ভাজা, গরম। আমি কিছু বলবার আগেই ও বল্লে—ব্রাহ্মণকে কথা দিয়েছিলাম খাওয়াবো। তাই ছোট্ট একটা তালের গোলা করে আপনার জন্যে গোটাকতক ভেজে এনেচি। গণ্ডা-দশ-বারো সবসুদ্ধ।আমি যাই, রান্নাবান্না সব পড়ে রয়েচে।

—শোনো দীপু, যেও না, আমার আলোটা জ্বেলে দিয়ে যাও।

—অত কুঁড়ে কেন? কই কোথায় দেশলাই দেখি!

—আচ্ছা, কেন তুমি আমার জন্যে তালের বড়া করতে গেলে, আর কারো জন্যে না?

—না, না, শুধু আপনার জন্যে। বাবার কাছে বলবেন না। কেউ জানেন না। সব লুকিয়ে ফেলেচি। তালের খোসা, তালের গোলা—চললাম। কেউ যেন জানে না।

দীপু চলে গেল। ওর তালের বড়ার বাটি আমার সামনে পড়ে রইল। জোনাকি-জ্বলা অন্ধকারে কোথায় কি নৈশ পুষ্প ফুটেচে তার সুবাস বেরুচ্চে।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।

দীপুর মনের ভেতরটা আমি এই নির্জন আঁধার সন্ধ্যায় বসে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ওর মুখের হাসিতে তা ধরা দিয়েছে। ওর মন আমি বুঝতে পেরেছি—ও নিজে হয়তো বোঝেই নি।

এখানে আমি আর থাকবো না। থাকা উচিত হবে না। অতিথির দলকে দত্তমশায় তোয়াজ করুন যত খুশি, তারা তালুকমৌজার বৈষয়িক সুবন্দোবস্ত যতদিন ধরে করুক বসে, কিন্তু আমাকে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। দত্তমশায় অতি সরল, ভালো লোক। দীপুও তাই। ওদের নামে কোনো কথা উঠলে আমি কখনো নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না। তা ছাড়া, জালে জড়াই কেন নিজেকে? আমার বাড়িতেও স্ত্রীপুত্র আছে।

সেই সপ্তাহের শেষেই নির্মমভাবে জাল গোটালাম।

দত্তমশায় এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন। বল্লেন—বলা কওয়া না, হঠাৎ চললেন, মানে? কি অপরাধ হল আমার ?

কোনো লম্বা কৈফিয়ৎ দেবার আবশ্যক বিবেচনা করিনি। ডাক্তারি ভালো চলচে না, রুগীপত্তর সুবিধে হচ্চে না। দীপু যাবার আগের দিন সন্ধেবেলা এলো।বল্লে—আপনি নাকি চলে যাচ্চেন, সত্যি?

—হ্যাঁ।

—কেন যাবেন?

—চলচে না।

—কেন, বেশ তো রুগী আসে?

—ওতে ডাক্তারি চলে না।

—যাবেন সত্যি?

—হুঁ।

দীপু কেঁদে ফেললে। চোখের জলে ভিজে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। আমি চলে যাবার সময় দত্তমশায়ের ডাকাডাকি সত্ত্বেও সে আমার সঙ্গে দেখা করেনি।

সাত মাস পরে দত্তমশায়ের এক চিঠি পেলাম। দীপুর খুব অসুখ। আমি যেন একবার দেখতে যাই। ইতিমধ্যে আমাদের গ্রামেই ডাক্তারখানা খুলে বসেছি। দু'একদিন যেতে দেরি হল। গিয়ে দেখি দীপু বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েচে। আগেকার স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী দীপুকে আর চেনা যায় না। আমায় দেখে দীপুর রোগশীর্ণ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিছানার পাশে ওর হাত দুটি ধরে বল্লাম—কি হয়েছে দীপু? দেখি হাত ?

ও বল্লে—কিছু হয়নি।

—তবে এমন চেহারা হয়েচে কি করে ? দাঁড়াও দেখি।

দত্তমশায় বোধ হয় অতিথির জন্যে চা ও খাবারের যোগাড় করতে বাইরে গেলেন।আমি ওর হাত দেখলাম। জ্বর রয়েচে নাড়িতে। পুরনো ম্যালেরিয়া জ্বর, ভালো চিকিৎসা হয়নি। সংসারের খাটুনি এক দিনের জন্যে কামাই যায়নি। অতিথি তো লেগেই আছে। অনুমানে বুঝলাম সব। শরীর ওর একেবারে ভেঙে গিয়েচে।

দীপু আমার দিকে তাকিয়ে বললে—কি রকম দেখলেন?

—ভালো। সেরে যাবে। গোটাকতক ইন্‌জেক্‌ নিয়মিত দিলেই হবে। শক্ত অসুখ কিছু না।

—একটা কথা বলবো?

—কি?

—আপনি এসে আমাদের বাড়ি আবার থাকুন না কেন?

—আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে। দাঁড়াও একটা ইন্‌জেক্‌শন দিতে হবে এখুনি।

—দেবেন এখন। আপনি আসবেন বলুন! সত্যি, বলুন!

দীপুকে বাঁচাতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত রাণাঘাট মিশন হাসপাতালে আমি ও দত্তমশায় নিয়ে গেলাম ওকে। শেষ দিন আমার হাত ধরে বলেছিল— আমি সেরে উঠলে আমাদের বাড়ি এসে থাকবেন, সত্যি? অনেক রুগী হবে এবার—

চূর্ণি নদীর ধারে সৎকার করার পরে আমরা দু’জনে ফিরে এলাম দেশে। দত্তমশায় আমার হাত ধরে কাঁদতে লাগলেন। বললেন—একলা থাকতে পারবো না ডাক্তারবাবু। আমার বাড়ি এসে আপনাকে থাকতে হবে। আমার আর কেউ নেই।

দীপুকে কথা দিয়েছিলাম হাসপাতালে। দত্তমশায়ের বাড়ি এসে আবার ডাক্তারখানা খুলেচি। দীপুর মুখের কথা সত্যি হয়েছে বটে, আজকাল রুগীর ভিড় খুব।